মাজার সংস্কৃতি: সহিংসতা, সংকট ও ভবিষ্যৎ ভাবনা

ভূমিকা: মাজার সংস্কৃতি বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির একটি অংশ। বাংলাদেশের জনগণ, সমাজ ও সংস্কৃতিরই একটি অনুষঙ্গ। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গটি ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের শিকার হয়ে বর্তমানে হুমকির মুখে পড়েছে। কেবল সুফি-সমাজ নয়, বরং বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ ও তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের উপর এ আঘাত কেউই মেনে নিতে পারছেন না। সুফি-সমাজ থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, নাগরিক সমাজ সকলেই চলমান সহিংসতার সমাপ্তি চাইছেন এবং একটি সমাধানের পথ খুঁজছেন। জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বজায় রাখতে এই সমাধান অত্যন্ত জরুরী।

মাজার

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে অতি পরিচিত এক পরিভাষা মাজার। বাংলায় মাজার বলতে বোঝানো হয়, কোনো সুফি-সাধক, অলি আউলিয়ার কবরকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামতপ্রাপ্ত উক্ত সুফি-সাধকের কবরকে উঁচু, পাকা ও সুসজ্জিতকরণের মাধ্যমে বিশেষায়িত করা হয়। এই বিশেষায়নের মাধ্যমে কেবল সুফি-সাধকের কবর নয়, বরং তার চারপাশও বিশিষ্ট ও পবিত্র ভূমি হিসেবে চিহ্নিত হয়। ফলত, সুফি-সাধকের কবরের পাশাপাশি চারপাশের নির্দিষ্ট স্থানও 'মাজার' হিসেবে গণ্য হয়।

'মাজার' শব্দটি এসেছে আরবী শব্দ জিয়ারুন থেকে। ফারসিতে বলা হয়, দরগাহ। আভিধানিক অর্থ সাক্ষাতের স্থান, পরিদর্শনের নির্দিষ্ট জায়গা ইত্যাদি। পরিভাষায়, জেয়ারতের জন্য বিশেষ ব্যক্তির কবরস্থানকে 'মাজার' বলা হয়।

জেয়ারত থেকে দুইটি পরিভাষা এসেছে, মাজার ও রওজা। দুটির অর্থ ও ধারণা প্রায় অভিন্ন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে 'রওজা' পরিভাষাটি খাসভাবে ব্যবহৃত হয়। যদিও অনেক অলি আউলিয়ার মাজারের সাইনবোর্ডে 'রওজা' শব্দটি ব্যবহার হয় তথাপি মানুষের কাছে তা 'মাজার' হিসেবেই গণ্য হয়। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক ও ব্যবহারের জায়গা থেকে বিবেচনা করলে 'রওজা' পরিভাষাটি নবীজীর জন্যই খাস। আর 'মাজার' পরিভাষাটি সুফি-সাধক, অলি-আউলিয়া ও বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য খাস।

মাজার সংস্কৃতি

মাজার মূলত জেয়ারতের স্থান। মুসলমানরা বরকত হাসিলের নিয়তে ও দোয়া কবুলের ওসিলা হিসেবে সুফি-সাধক, অলি-আউলিয়ার মাজার জেয়ারত করে থাকেন। কিন্তু কেবল জেয়ারতেই মাজারকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ নয়।

যে সুফি-সাধক, অলি-আউলিয়ার মাজার তাঁর জন্ম ও ইন্তেকাল দিবস তাঁর আওলাদ, মুরিদ ও ভক্তবৃন্দের জন্য বিশেষ দিবস। উক্ত বিশেষ দিবসসমূহে মাজার, দরবার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মিলাদ, মাহফিল, সামা সঙ্গীত, খাবারদাবারের আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনকে বলা হয় 'উরস'। উরসকে কেন্দ্র করে মাজার প্রাঙ্গণে উক্ত সুফি-সাধক, অলি-আউলিয়ার মুরিদ ও ভক্তবৃন্দের বৃহৎ সমাগম ঘটে। ফলত একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। একটি মাজার বা দরবারের প্রধান ইভেন্ট হলো উরস। সচরাচর মাজারের ক্ষেত্রে উরস হয় একটি এবং দরবারের ক্ষেত্রে একাধিক। মাজারের তুলনায় দরবারের পরিসর বৃহৎ। একটি দরবারে একাধিক সুফি-সাধক, অলি-আউলিয়ার মাজার থাকে; প্রত্যেক সুফির জন্য স্বতন্ত্র উরস সংঘটিত হয়।

উরসকে কেন্দ্র করে বসে মেলা। ফার্নিচার থেকে শুরু করে কাঁচাবাজার, পোশাক থেকে শুরু করে আচার– সব ধরনের জিনিসপত্রের সমাহার ঘটে। বিপুল পরিমাণের বৈচিত্রপূর্ণ দোকান ও উরসে আগত অসংখ্য দর্শনার্থীদের ভিড়ে মেলা হয়ে উঠে উরসের অন্যতম আকর্ষণীয় অনুষঙ্গ। বেশিরভাগ মাজার ও দরবারে প্রতি বৃহস্পতিবার অথবা সপ্তাহের যে কোনো একদিন সামা সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। মুরিদ ও ভক্তবৃন্দরা উক্ত সামা উপভোগ করেন। আল্লাহ ও রাসুল প্রশস্তি, বিখ্যাত সুফি সাধক, মাজারে শায়িত ব্যক্তিদের নিয়ে রচিত ও অন্যান্য ভাবজগতের সঙ্গীতকে সুফি পরিভাষায় সামা বলা হয়।

মাজারের উরস, উরসকেন্দ্রিক মেলা ও সামা সঙ্গীতের মাহফিলের ব্যাপারে সুফি-সমাজের একাংশের আপত্তি রয়েছে। আপত্তির ক্ষেত্রে সুফি তরিকার ও সিলসিলার বৈচিত্রগত দিকটিই মুখ্য। সিলসিলার কাঠামোগত ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে কিছু দরবার এ বিষয়গুলোর বিষয়ে অনুৎসাহিত করে। এর পেছনে উরস, মেলা ও সামা সঙ্গীতে অসামাজিক কার্যকলাপ ও অশ্লীল সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের ভূমিকাও রয়েছে। কেবল উরস, মেলা বা সামার বিষয়ে নয়, বরং মাজার সংস্কৃতির সঙ্গে সকল প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপ ও অশ্লীল সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের বিরুদ্ধে সুফি-সমাজের সোচ্চার অবস্থান রয়েছে। প্রায় প্রতিটি উরসে দরবার থেকে যাবতীয় নেতিবাচক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়। অর্থাৎ মাজার সংস্কৃতিকে বিতর্কিত কর্মকাণ্ড থেকে হেফাজতে রাখতে সুফি-সমাজের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস জারি আছে।

মাজারের আরেকটি ঐতিহ্য হলো, লঙ্গরখানা। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের জন্য মাজার, দরবারে খাবারের আয়োজন করা হয়। মাজারে আগত মুরিদ ও ভক্তবৃন্দরা তোহফা, তাবারুক হিসেবে যে খাবারদাবার নিয়ে আসেন তা মাজারে উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝে বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি মাজার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও অনেক সময় খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। খাবারের মধ্যে খিচুড়ি একটি কমন আইটেম।

মাজারকে কেন্দ্র করে অনেক ঘরছাড়া অসহায় ব্যক্তি, বাস্তুহারা মানুষ, পাগলবেশে সাধু সন্ন্যাসী, বাউল ফকিররা বসবাস করেন। তাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হয় মাজারে আগত মুরিদ, ভক্তবৃন্দের মাধ্যমেই। তাদের পাশাপাশি সমাজের অনেক অসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে মাজার।

উরস, সামা, মিলাদ, মেলা, খানকাহ, লঙ্গরখানা ইত্যাদি নিয়েই গড়ে উঠেছে মাজার সংস্কৃতি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদের যে ধারণা ছিল, বিশেষত নবীজীর হাতে গড়া মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে যে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো তার সাথে মাজার সংস্কৃতির একটি সাদৃশ্য রয়েছে। মাজার সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিম সমাজের যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের জনসংযোগ লক্ষ করা যায় তার পেছনে এই ঐতিহাসিক যোগসূত্রের প্রভাব রয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে মাজার সংস্কৃতি

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও প্রচার-প্রসারের সঙ্গে মাজারের ইতিহাস জড়িত। দেশের জনসংখ্যার যে উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলমান তার পেছনে মাজার সংস্কৃতির ভূমিকা প্রশ্নাতীত। বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও প্রচার-প্রসারে যে সকল সুফি-সাধক, অলি-আউলিয়া নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের প্রায় সকলেরই মাজার রয়েছে। বাংলার প্রথম সুফি হিসেবে পরিচিত হজরত শাহ সুলতান রুমি থেকে শুরু করে হজরত শাহজালাল, খানজাহান আলী, শাহ আলী, পীর বদর, মোহসেন আউলিয়া, শাহ সুলতান বলখীসহ সকলেরই মাজার রয়েছে। মাজার সংস্কৃতির যে ধারণা উল্লেখ করা হয়েছে এ সংস্কৃতির চর্চা তাঁদের মাজার স্থাপন থেকেই শুরু হয়েছে।

মাজার সংস্কৃতির মধ্যে একটি মানবিক দিক রয়েছে, যে দিকটি মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিমদেরও মুগ্ধ করে। তাঁদের মাজার ছিল সকল ধর্মের মানুষের জন্য নিরাপদ, পাশাপাশি লঙ্গরখানায় যে কোনো ধর্মের মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা ছিল। উরস ও মেলাতেও ভিন্নধর্মী জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। ফলত, মাজারের এই উদারনৈতিক, মানবিক ও অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেছে।

মুসলিম সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র মাজার। সমাজের সকল স্তরের মানুষের অবাধ যাতায়াত সবসময়ই ছিল। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের লোকজন যেমন নজরানা নিয়ে মাজারে যায় তেমনি সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের লোকজনও দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য কাতর মিনতি, মাজারে শায়িত সুফির ওসিলায় দোয়া ও অভুক্ত মানুষ খাবারের আশায় মাজারে যান। এর মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মেলবন্ধনের সুযোগ তৈরি হয়।

আধুনিক সময়ে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার'র যে ধারণা তা মাজারের মাধ্যমে বাংলাদেশে গত হাজার বছর ধরেই চলমান রয়েছে। মাজার, দরবারের ধনী ও মধ্যবিত্ত ভক্তরা দান করেন এবং তা থেকে নিম্নবিত্ত অসহায় মানুষের আবাসন ও আহার জোটে। জমাকৃত সম্পদের এই বণ্টন বাংলাদেশের হাজার হাজার মাজারের মাধ্যমে এখনো চলমান আছে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে মাজার সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল, এমনকি রাজধানী ঢাকাতেও, যত মাজারে যত উরস হয় প্রতিটি উরসের সরাসরি সাংস্কৃতিক প্রভাব রয়েছে। বেশিরভাগ উরসেই স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী পারফর্ম করার সুযোগ পান এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরাও উরসকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট হিসেবে বিবেচনা করেন। বাংলাদেশের সঙ্গীত অঙ্গনে এমন কোনো শিল্পী খুঁজে

পাওয়া দুষ্কর হবে যার সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উরসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব নেই। উরসে হয় প্রধানত ভাবজগতের সঙ্গীত যা চিশতিয়া তরিকার সুফি-সাধনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। সকল উরসে সঙ্গীতের আয়োজন হয় তা নয়, তবে বেশিরভাগ উরসেই আল্লাহ ও রাসুল প্রশস্তি, আউলিয়া প্রশস্তি ও ভাবজগতের সঙ্গীতের আয়োজন থাকে। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন জায়গায় উরসের নামে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অশোভনীয়, অসামাজিক কার্যকলাপমূলক যে সঙ্গীতের আয়োজন করা হয় তার সাথে মাজার সংস্কৃতির ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। মাজার সংস্কৃতির সঙ্গে যে সঙ্গীতের সম্পর্ক তা প্রশস্তি ও ভাবমূলক; অসামাজিক ও অশ্লীল বিষয়ের সঙ্গীতকে সুফি-সমাজ সর্বদাই পরিত্যাগ করেছে।

মাজারের লঙ্গরখানায় যে সর্বস্তরের মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয় তা বাংলার আপ্যায়নমূলক ঐতিহ্যকে ধারণ করে। মেহমানদারির যে ঐতিহ্য বাংলার সমাজব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উপকরণ তার রিফ্লেকশন মাজার সংস্কৃতিতেও বিদ্যমান। মুসাফিরের জন্য থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করা ইসলামে উচ্চস্তরের এবাদত হিসেবে গণ্য। বাংলার কেবল মুসলমান সমাজেই নয়, বরং ধর্ম নির্বিশেষে সকল সমাজেই মুসাফিরের প্রতি এই আদর, আপ্যায়ন বরাদ্দের ইতিহাস আছে। এই ধারার সাথে হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে মাজার ও লঙ্গরখানার। একটি মাজার, দরবারে চাইলেই যে কোনো মুসাফির রাত কাটাতে পারেন নির্বিঘ্নে।

উরসকে কেন্দ্র করে যে মেলার আয়োজন হয় তা স্থানীয় অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখে। এমন অসংখ্য উরস বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় যে উরসে বিক্রির জন্য কৃষকরা সারাবছর চাষাবাদ করেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মুখিয়ে থাকেন উরসের জন্য; উরস অত্যন্ত ব্যবসাবান্ধব একটি ইভেন্ট। ফার্নিচার থেকে শুরু করে খেলনা, সবজি থেকে আচার সকল ধরনের জিনিসপত্রের সমাহারে আয়োজিত মেলায় লেনদেন হয় লাখ থেকে কোটি টাকা পর্যন্ত। মাজার সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ এই উরসকেন্দ্রিক অর্থনীতি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উরসের তারিখ। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল উরসের তারিখ বাংলা মাস অনুযায়ী নির্ধারিত। যেমন: মাইজভাণ্ডারের দুইটি বড় উরস ১০ মাঘ ও ২২ চৈত্র; সিলেটের মুড়ারবন্দ দরবারের উরস ৩০ পৌষ থেকে ২ মাঘ। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, মাজার ও দরবারের মুরিদ, ভক্তবৃন্দের অধিকাংশই কৃষক। বাংলার কৃষি ব্যবস্থার আদলেই তৈরি হয়েছে বাংলা ক্যালেন্ডার। ফলত, উরসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টকে বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট করার মাধ্যমে বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মাজার বা দরবারের আন্তরিক সংযোগের প্রমাণ বহন করে। দ্বিতীয়ত, উরসের সুনির্দিষ্ট তারিখ বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হওয়ায় পরবর্তীতে যত প্রজন্ম উক্ত মাজার বা দরবারের মুরিদ ও ভক্ত হবে তাদের মাঝে বাংলা ক্যালেন্ডারের একটি চর্চা থাকবে। মাজার সংস্কৃতি যে বহিরাগত বা আধিপত্যবাদী কিছু নয়, বরং বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছে তারই একটি দৃষ্টান্ত এটি।

মাজারকে বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত সমাজের সাংস্কৃতিক চাহিদা ও চর্চার একমাত্র নিরাপদ জায়গা বললেও অত্যুক্তি হয় না। মাজার যে কোনো ধর্মের, যে কোনো স্তরের, যে কোনো পেশার লোকদের জন্য উন্মুক্ত। ফলত, নিম্নবিত্তের মানুষেরা সাংস্কৃতিক খোরাক মেটাতে মাজারে গমন করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হজরত শাহ আলীর মাজারে প্রতি বৃহস্পতিবার যে ভাবগানের আসর বসে সেখানে গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই নিম্নবিত্তের পেশাজীবী শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ। এমন হাজারো মাজার আছে বাংলাদেশে, যেখানে সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষজন নিজেদের জীবনযাপনের অর্থ তালাশ করে।

ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে মাজার সংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ জনপদে তো বটেই, শহুরে নাগরিক জীবনেও মাজারের উরস, সামা, লঙ্গরখানা ও মেলার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। ফলত, বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে মাজার সংস্কৃতি গভীরভাবে যুক্ত।

মাজার সংস্কৃতি ও সহিংসতা

বাংলাদেশে মাজারকেন্দ্রিক সহিংসতা নতুন কোনো বিষয় নয়। ২০০৪ সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী হজরত শাহজালালের মাজারে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনার ফলে সকল মাজার ও দরবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ঘটনার পর সকলে আতঙ্কে থাকলেও আর বড় কোনো ধরনের হামলা ঘটেনি। দীর্ঘ ২০ বছর পর ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের পতনের পর আবারো মাজারকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। অভ্যুত্থানের পর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে, ৫ আগস্ট থেকে অদ্যাবধি, গত ১৫ মাস যাবৎ ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাজার, খানকাহ, উরসের উপর হামলা হয়েছে। পরিস্থিতি এত ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, মাজার থেকে লাশ উত্তোলন করে পোড়ানোর ঘটনাও ঘটেছে।

২৩ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে বিশ্ব সূফী সংস্থা সংবাদ সম্মেলন করে জানায় যে, ৮০টির বেশি মাজার ও দরবারে হামলা হয়েছে।[১] ২৩ জানুয়ারি থেকে এখনো পর্যন্ত ৯ মাস অতিবাহিত হয়েছে; এই ৯ মাসে সংখ্যাটি দ্বিগুণ হয়েছে। একই সংস্থা ১৯ সেপ্টেম্বর জানিয়েছে, ১৮৫টির বেশি মাজার, দরগাহ, দরবার, উরসে হামলা হয়েছে।[২] মানবাধিকার সংস্থা এমএসএফ জানিয়েছে, কেবল সেপ্টেম্বর মাসেই মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২টি ঘটনা ঘটেছে।[৩] কুমিল্লায় মাইকিং করে লোক জড়ো করে পরিকল্পিতভাবে মাজারে হামলা করা হয়েছে। হজরত শাহপরানের মতো বিখ্যাত আউলিয়ার উরসেও একাধিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও বহু উরস, মেলা এমনকি মিলাদুন্নবীর মিছিলেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। কোনো ঘটনাতেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি, উল্টো প্রশাসনের গাফিলতিই ছিল লক্ষণীয়। হামলাকারী, উস্কানিদাতা সকলেরই সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউবে ভিডিও ফুটেজ থাকলেও প্রশাসন ফুটেজগুলো কাজে লাগিয়ে বড় সংখ্যক অপরাধীকেই আইনের আওতায় আনতে পারেনি। এক্ষেত্রে অপরাধীদের পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে প্রশাসনের গাফিলতিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

মাজারে হামলা করার মাধ্যমে পুরো মাজার সংস্কৃতিকেই আক্রমন করা হয়েছে। হামলাকারীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় মাজার সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়কে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরে হামলার বিষয়ে জনমত তৈরি করার চেষ্টা করেছে। মাজারের পাশাপাশি মাজার সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ উরসেও একাধিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। হজরত শাহ পরানের মতো বিখ্যাত আউলিয়ার উরসেও হামলা হয়েছে। এছাড়াও নোয়াখালীতে ঘাসিপুর দরবার শরিফের উরসে, বরগুনায় ইসমাইল শাহ'র উরসে, নেত্রকোনায় শাহ নেওয়াজ ফকিরের উরসে হামলা করা হয়েছে। হামলাকারীদের হস্তক্ষেপে উরসকেন্দ্রিক আয়োজিত মেলা বন্ধ হবার ঘটনাও ঘটেছে। বাংলার ঐতিহাসিক গাজী কালু চম্পাবতী উপাখ্যানের বিখ্যাত চরিত্র গাজী পীরের উরসকে কেন্দ্র করে যে শতবর্ষী মেলা অনুষ্ঠিত হয় তা এ বছর মাজার সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচারণকারী গোষ্ঠীর বাধার মুখে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। জেলা প্রশাসক তো এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি, উল্টো বলেছেন, "আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় এ বছর মেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে মারামারিও হয়েছে। অনুমতি দিলে আরও খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত।"[৪] মাথাব্যথার ভয়ে মাথাই কেটে ফেলা হলো।

প্রধান উপদেষ্টার দফতর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থাপনা ও সুফি মাজার সম্পর্কিত যে কোনো বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও হামলার তীব্র নিন্দা জানায়। এসকল হামলার সাথে জড়িতদের অতি দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।"[৫]
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেছেন, "যারা মাজারে হামলা করবে তাদের ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স"।[৬]
চলতি বছরের ১১ আগস্ট ধর্ম উপদেষ্টা বলেছেন, "মাজারে হামলাকারীদের ছাড় দেয়া হবে না"।[৭]

এই বক্তব্যের পরের মাসেই মাজারে হামলার ঘটনা আরো বেড়েছে। চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি, সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাজারে হামলার ঘটনায় ২৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে; ইতোমধ্যে ৯ মাস পার হলেও এই ২৩ জনের ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানা যায়নি। কুমিল্লায় সেপ্টেম্বর মাসে মাইকিং করে লোক জড়ো করে পরিকল্পিতভাবে হামলার ঘটনায় ২২০০ লোককে অজ্ঞাতনামা

---

১. https://www.prothomalo.com/bangladesh/lharp6v3y6
২.
https://www.dw.com/bn/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87/a-74069567
৩. https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et
৪. https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-674876
৫. https://www.facebook.com/share/p/179A8SSMzZ/
৬. https://www.youtube.com/watch?v=uBVY69Aqj0Q
৭. https://www.youtube.com/watch?v=kY3-jbcZ4aY

আসামি করে মামলা করেছে পুলিশ। অথচ একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন: "পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সামনেই ঘণ্টাব্যাপী হামলা হয়। হামলাকারীদের নেতারা সবার পরিচিত, তবুও মামলায় কারও নাম নেই।"[৮]

অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে মাজারে হামলার বিষয়ে যেসব পদক্ষেপ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। হামলার পূর্বে সোশ্যাল মিডিয়ায় হামলাকারীদের ঘোষণা, মাইকিং করে লোক জড়ো করার পরও হামলা ঠেকাতে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা এবং হামলার পর হামলাকারীদের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণেই মূলত মাজারে হামলার ঘটনা অভ্যুত্থানের ১৫ মাস পরও অব্যাহত রয়েছে। একটি মাজারে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা মানে পরবর্তী হামলায় উৎসাহিত করা। যে উৎসাহ হামলাকারীদেরকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই অভ্যুত্থানের ১৫ মাস পরও তারা মাজারে হামলার মাধ্যমে বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় তৈরি করছে।

বর্তমান পরিস্থিতি ও সংকট

জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ও ধারাবাহিকভাবে মাজারে হামলার ফলে বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধশতাংশ সুফি-সমাজ, মাজার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। এই অর্ধশতাংশ জনগণের সামাজিক মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক আদর্শ হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের সুফি-সমাজ, মাজার সংস্কৃতি ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ও সঙ্কটাপন্ন সময় অতিক্রম করছে। একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে।

গত ৭০০ বছর যাবৎ হজরত শাহ পরানের মাজারের উরসে আখেরি মোনাজাতের পর শিরনি বিতরণ করা হতো। কিন্তু এ বছর হামলাকারীদের আতঙ্কে শিরনি বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। মাজারের খাদেম আব্দুল আজিজ বলেন, 'প্রশাসনের সবাইকে নিয়ে সভায় আমাদের জানানো হয় শিরনি বিতরণে মারামারি হয়, তাই এ বছর শিরনি বিতরণ করা যাবে না। অথচ আগে কখনো এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। এখন বলা হচ্ছে দেশের পরিস্থিতি ভালো নয়। তাই আমাদের কিছু করার নেই, প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়েছে।'[৯] আতঙ্ক ও আশঙ্কায় এমন আরও অনেক মাজার, উরসের কার্যক্রম সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। আগের মতো আর নির্বিঘ্নে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছেন না সুফি-সমাজ।

মাজার সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি ধর্মীয় আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটে। এটি কেবল লোকচর্চার বিষয় নয়, বরং ইসলাম ধর্মের অত্যন্ত শক্তিশালী সুফিধারার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ। ফলত মাজারে হামলার মাধ্যমে জনগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এই বিষয়ে যে, ভিন্নধর্মের, ভিন্নমতের, ভিন্ন মতাদর্শের বাস্তবায়ন কি আর সম্ভব নয়? ভিন্ন মতাদর্শের বাস্তবায়ন হলেই এমন হামলার মুখে পড়তে হবে? হামলার ভয়ে কি ভিন্ন মতাদর্শের চর্চা ধীরে ধীরে সমাজ ও সংস্কৃতিতে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে? বাংলাদেশের মানুষ এমন বহু প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে উদ্বিগ্নতা নিয়ে দিনাতিপাত করছে।

মাজার সংস্কৃতির উপর হামলার মাধ্যমে যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মাজার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার উপর আঘাত করা হয়েছে। রাজনৈতিক ফ্যাসিজমকে হটিয়ে আমরা একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজমের দিকে যাচ্ছি কি-না এমন প্রশ্নও উঠেছে। মাজার সংস্কৃতির উপর আঘাতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উপর আঘাত এসেছে। উরস, মেলা, এমনকি মিলাদুন্নবীর মিছিলেও হামলার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ কায়েমের ইশারা স্পষ্ট হয়েছে।

---

৮. https://bortamanbangla.com/news/1696/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E2%80%99-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%85%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E2%80%99%C2%A0

৯. https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2025/08/29/1569847

সংস্কৃতির মাধ্যমে যে অর্থনীতি বিকশিত হয়, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অর্থনীতি তা পঙ্গু হয়ে গেছে। মাজারের পাশে থাকা মোমবাতি, আগড়বাতি, আতরের দোকানিরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে; উরসের আয়োজন ও পরিসর দিনদিন সঙ্কুচিত হচ্ছে বিধায় উরসকে কেন্দ্র করে যে সকল হকার, দোকানিরা বড় অঙ্কের উপার্জন করতেন তাদের জীবিকা নির্বাহের পরিসর সঙ্কুচিত হয়েছে; উরসকে কেন্দ্র করে আয়োজিত মেলার আয়োজন কমে আসছে, যাও হচ্ছে তাতে কতজন দোকানি, ব্যবসায়ী অংশ নিচ্ছেন এবং কতটা নিরাপদ বোধ করে কত টাকা লগ্নি করছেন তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। সবমিলিয়ে মাজার সংস্কৃতির মাধ্যমে যে সাংস্কৃতিক অর্থনীতির একটি সুবিশাল খাত পরিচালিত হতো তার প্রায় পুরোটাই নাকাল অবস্থায় আছে। মাজার সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি কত হকার, ব্যবসায়ী যে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার সঠিক হিসাব নিরূপণ করা কঠিন।

মাজারে সহিংসতার ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সর্বোপরি সার্বিক সংকট তৈরি হয়েছে। নাগরিকদের মাঝে ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতাদর্শ, সাংস্কৃতিক চর্চার জায়গায় সন্দেহ তৈরি হয়েছে, পারস্পরিক অবিশ্বাস বেড়েছে। নাগরিকদের মাঝে যদি মতাদর্শিক বিভেদের কারণে এমন সন্দেহ বাড়তে থাকে তাহলে তাতে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতাই হুমকির মুখে পড়বে।

ভবিষ্যৎ ভাবনা

বর্তমান সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিকে যে কোনো মূল্যে মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতেই মাজারের উপর সঙ্ঘবদ্ধ হামলাকে রোধ করতে হবে। এটি কেবল সুফি-সমাজ বা মাজার সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত গোষ্ঠীর বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জাতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় হিসেবে গণ্য। যে কারণে মাজারে হামলা বিষয়ে সরকার, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা একযোগে কথা বলেছেন, কাজ করেছেন। এখন করণীয়, সমূহ সঙ্কটের কারণ চিহ্নিত করা ও মোকাবেলার পথ স্পষ্ট করা।

৫ আগস্ট থেকেই মাজারে হামলা শুরু হয়েছে। অদ্যাবধি এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু হামলার শিকার হওয়া মাজার এবং অন্যান্য প্রভাবশালী দরবারসমূহের পক্ষ থেকে সঙ্ঘবদ্ধ মোকাবেলা বা প্রতিরোধের কোনো কার্যকরী উদ্যোগ দেখা যায়নি। অর্থাৎ সুফি-সমাজ ও মাজার সংস্কৃতির নেতৃবৃন্দের মাঝে সার্বিক যোগাযোগ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সংকট রয়েছে। এই অভ্যন্তরীণ সংকট যথাশীঘ্র দূরীভূত করতে না পারলে বহিরাগত সঙ্কট নিরসন করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মাজারে হামলাকারীরা কিছু বিতর্কিত বিষয় অবতারণার মাধ্যমে হামলার বৈধতা উৎপাদন করতে ইচ্ছুক। যত বিতর্কিত কারণই থাকুক না কেন, হামলাকে কোনো বৈধতা দেয়া যাবে না। কিন্তু যে বিষয়গুলোকে সামনে রেখে মাজার সংস্কৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় সে বিষয়গুলো নিয়ে মাজার সংস্কৃতির চর্চাকারী, পৃষ্ঠপোষকদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। কেন এ বিষয়গুলো বারংবার সামনে আসে, কাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে বিতর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, কারা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত ও লাভবান হয়– এ প্রশ্নগুলোর আলোকে মাজার সংস্কৃতির কার্যক্রম নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা জরুরী। মাজারে সহিংসতা রোধ করতে চাইলে আত্মসমালোচনার জায়গাও উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং নিজস্ব ঘাটতির জায়গায় উন্নতি করতে হবে।

বাংলাদেশের মাজারের সাথে রাজনীতির একটি যোগসূত্র আছে। জাতীয় নির্বাচনের আগে হজরত শাহজালাল, শাহ আমানতসহ বিখ্যাত কোনো এক আউলিয়ার মাজার জেয়ারতের মাধ্যমে রাজনীতিবিদরা নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। মাজার, দরবারের উরসেও রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন সময়ে হাজিরা দিয়ে থাকেন। কিন্তু জেয়ারতের পর উক্ত মাজার, দরবারের সাথে উক্ত নেতার কতটুকু যোগাযোগ থাকে, মাজার বা দরবার সম্পর্কে উক্ত নেতা কতটুকু খোঁজখবর রাখেন তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অর্থাৎ, রাজনৈতিক কারণে মাজারকে ব্যবহার করে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আর খোঁজখবর না রাখার এই কুপ্রথা থেকে রাজনীতিবিদদের বেরিয়ে আসতে হবে। সহস্রাধিক শহীদের রক্তের মাধ্যমে সংঘটিত জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন জনগণ দেখেছে ও দেখছে সেখানে এমন রাজনীতিবিদের টিকে থাকা কঠিন। অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে, সঙ্গত কারণেই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল স্মরণকালের সবচেয়ে বাজে অবস্থায়। তখন ছাত্র-জনতা সম্মিলিতভাবে ট্রাফিক, ডাকাত প্রতিরোধ, রাস্তাঘাটের ময়লা পরিষ্কার ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। এভাবে বাংলাদেশের যত জায়গায় মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি দায়িত্ব নিয়ে মোকাবেলার চেষ্টা করতেন তাহলে হয়তো মাজারে হামলার ঘটনা আরও কম ঘটতে পারতো। নির্বাচনী প্রচারণা ও অন্যান্য সময়ে সুফি-সমাজ যেভাবে রাজনীতিবিদদের সহযোগিতা করে, সুফি-সমাজের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রাজনীতিবিদদের থেকেও একই ধরনের সহযোগিতা কাম্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা প্রায় শূন্যের কোঠায়। বর্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সুফি-সমাজের পাশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে

হবে। সামাজিক অস্থিরতা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় রোধ করতে না পারলে সুষ্ঠু রাজনৈতিক চর্চাও বাধাগ্রস্ত হবে। সুতরাং, রাজনৈতিক স্বার্থেই রাজনীতিবিদদের উচিত মাজার সংস্কৃতির উপর চলমান সহিংসতা রোধে সুফি-সমাজের সঙ্গে সমন্বয় করে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

অদ্যাবধি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে সুফি-সমাজের ভূমিকা এবং মেইনস্ট্রিম সাংস্কৃতিক চর্চায় মাজার সংস্কৃতির অবস্থান অত্যন্ত ক্ষীণ। এটি নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা হওয়া প্রয়োজন যে, সুলতানী আমল থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্বে দেয়া সুফি-সমাজ কেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সূচনা থেকে অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। সুফি-সমাজ চলমান যে সঙ্কটের মুখোমুখি তার পেছনে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে, রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে ও জনগণের স্বার্থের লড়াইয়ে তারা নিজেদের অংশগ্রহণ ও গুরুত্ব অনুধাবন করাতে সক্ষম হননি। সুফি-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং কীভাবে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে প্রভাব রাখা ও জনগণের স্বার্থের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় তার পরিকল্পনা সাজাতে হবে। দরবার থেকে সরাসরি রাজনৈতিক ময়দানে নেমে যেতে হবে এমনটি নয়, বরং এতটুকু রাজনৈতিক সচেতনতা থাকা জরুরী যতটুকু থাকলে সুফি-সমাজকে বেইনসাফি, জুলুমের পক্ষে কথা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে না। এমন বেশ কিছু মাজারে হামলা হয়েছে যে মাজারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি জুলুমের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। ফলত, উক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তির জুলুমের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে পুরো মাজার, দরবার এমনকি সুফি-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাজার সংস্কৃতির উপর চলমান সহিংসতার পেছনে এই রাজনৈতিক কারণটি ভূমিকা রেখেছে এবং এই প্রশ্নকে মোকাবেলা না করে সহিংসতা রোধ করা কঠিন হবে।

নাগরিকের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব সরকারের। নাগরিকের ধর্মীয় মতাদর্শ লালন ও পালনের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্বও তাদের। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হবে তাদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে ধর্মীয় মতাদর্শ লালন ও পালনের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। মাজার সংস্কৃতির উপর চলমান সহিংসতা রোধ করাই হবে তাদের প্রধান কর্তব্য। এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদেরকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

উপসংহার: মাজার সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিকভাবে আক্রমণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে নস্যাৎ করা হয়েছে। অভ্যুত্থানের পর ১৫ মাস অতিবাহিত হবার পরও যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি হয়নি তার পেছনে মাজারে হামলা রোধ করতে না পারা অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বোপরি সার্বিক স্বার্থেই এই সহিংসতাকে প্রাথমিকভাবে রোধ ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে মোকাবেলা করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, সমাজের দায়িত্বশীল ভূমিকায় থাকা রাজনীতিবিদ, মাজার ও দরবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাংগঠনিক শক্তিমত্তা, পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং অভ্যন্তরীণ সঙ্কট নিরসনের মাধ্যমেই সম্মিলিতভাবে চলমান সহিংসতার সমাপ্তি ঘটাতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মাজার সংস্কৃতির উপর সহিংসতার সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে বাংলাদেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত হতে পারে।

প্রস্তাবনা

মাজার সংস্কৃতিকে ঘিরে সঙ্ঘবদ্ধ ও ধারাবাহিকভাবে সহিংসতার ফলে উদ্ভূত বিদ্যমান সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ৫টি প্রস্তাব:

১. জুলাই অভ্যুত্থানোত্তর বাংলাদেশে যত মাজার, দরবার, খানকাহ'র উপর হামলা হয়েছে সকল ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন, ক্ষতিপূরণ, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে।
২. হামলা, আক্রমণের প্রতিটি ঘটনার তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করতে হবে।
৩. হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ মাজার, দরবার, খানকাহ'র কাঠামোগত সংস্কার ও যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৪. ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশের সকল দরবার, মাজারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দায়িত্বশীল সদস্যের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে একটি 'জাতীয় সুফি-সমাজ/মাজার সংস্কৃতি/মাজার/দরবার সুরক্ষা কমিটি' গঠন করতে হবে। কমিটির নীতিমালা, কার্যপরিধি ও অন্যান্য বিষয়ে সুফি-সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।
৫. বাংলাদেশের সুফি-সমাজ, দরবার, মাজার, খানকাহ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে একটি স্বতন্ত্র 'গবেষণা প্রকল্প' চালু করতে হবে।

(বাংলাদেশের সকল দরবার, মাজারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে খসড়াটির সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধনপূর্বক চূড়ান্ত প্রস্তাবনা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হবে।)